

পল্লিজননী

জসীমউদ্দীন

[কবি পরিচিতি : জসীমউদ্দীন ১৯০৩ খ্রিষ্টাব্দে ফরিদপুর জেলার তামুলখানা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। কবি তাঁর কবিতায় বাংলাদেশের পল্লিপ্রকৃতি ও মানুষের সহজ স্বাভাবিক রূপটি তুলে ধরেছেন। পল্লির মাটি ও মানুষের জীবনচিত্র তাঁর কবিতায় নতুন মাত্রা পেয়েছে। পল্লির মানুষের আশা-স্বপ্ন-আনন্দ-বেদনা ও বিরহ-মিলনের এমন আবেগ-মধুর চিত্র আর কোনো কবির কাব্যে খুঁজে পাওয়া ভার। এ কারণে তিনি ‘পল্লিকবি’ নামে খ্যাত। কর্মজীবনের শুরুতে তিনি কিছুকাল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেন। পরে সরকারি তথ্য ও প্রচার বিভাগে উচ্চপদে যোগদান করেন। ছাত্রজীবনেই তাঁর কবিপ্রতিভার বিকাশ ঘটে। বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নকালেই তাঁর রচিত ‘কবর’ কবিতাটি প্রবেশিকা বাংলা সংকলনের অন্তর্ভুক্ত হয়। জসীমউদ্দীনের উল্লেখযোগ্য কাব্যের মধ্যে রয়েছে নক্সী-কাঁথার মাঠ, সোজনবাদিয়ার ঘাট, রাখালী, বালুচর, হাসু, এক পয়সার বাঁশি, মাটির কান্না ইত্যাদি। তাঁর নক্সী-কাঁথার মাঠ কাব্য বিভিন্ন বিদেশি ভাষায় অনূদিত হয়েছে। চলে মুসাফির তাঁর ভ্রমণকাহিনী। বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে সম্মানসূচক ডি.লিট. ডিগ্রি প্রদান করে। এছাড়া সাহিত্য-সাধনার স্বীকৃতিস্বরূপ তিনি একুশে পদক লাভ করেন। ১৯৭৬ সালের ১৩ই মার্চ কবি ঢাকায় মৃত্যুবরণ করেন।]

রাত থম থম স্তব্ধ নিঝুম, ঘোর-ঘোর-আন্ধার,
নিশ্বাস ফেলি তাও শোনা যায় নাই কোথা সাড়া কার।
রুগুণ ছেলের শিয়রে বসিয়া একেলা জাগিছে মাতা,
করুণ চাহনি ঘুম ঘুম যেন ঢুলিছে চোখের পাতা।
শিয়রের কাছে নিবু নিবু দীপ ঘুরিয়া ঘুরিয়া জ্বলে,
তারি সাথে সাথে বিরহী মায়ের একেলা পরাণ দোলে।
ভন ভন ভন জমাট বেঁধেছে বুনো মশকের গান
এঁদো ডোবা হতে বহিছে কঠোর পচান পাতার দ্বাণ।
ছোট কুঁড়েঘর, বেড়ার ফাঁকেতে আসিছে শীতের বায়ু,
শিয়রে বসিয়া মনে মনে মাতা গণিছে ছেলের আয়ু।
ছেলে কয়, ‘মারে, কত রাত আছে, কখন সকাল হবে,
ভালো যে লাগে না, এমনি করিয়া কেবা শুয়ে থাকে কবে।’
মা কয়, ‘বাছারে ! চুপটি করিয়া ঘুমো ত একটি বার’,
ছেলে রেগে কয়, ‘ঘুম যে আসে না কি করিব আমি তার।’
পাণ্ডুর গালে চুমো খায় মাতা। সারা গায়ে দেয় হাত,
পারে যদি বুকে যত স্নেহ আছে ঢেলে দেয় তারি সাথ।

নামাজের ঘরে মোমবাতি মানে, দরগায় মানে দান,
 ছেলেরে তাহার ভালো করে দাও কাঁদে জননীর প্রাণ ।
 ভালো করে দাও আল্লা-রসুল! ভালো করে দাও পীর,
 কহিতে কহিতে মুখখানি ভাসে বহিয়া নয়ন নীর!
 বাঁশ বনে বসি ডাকে কানা কুয়ো, রাতের আঁধার ঠেলি,
 বাদুড় পাখার বাতাসেতে পড়ে সুপারির বন হেলি ।
 চলে বুনো পথে জোনাকি মেয়েরা কুয়াশা কাফন ধরি,
 দুঃ ছাই! কিবা শঙ্কায় মার পরাণ উঠিছে ভরি ।
 যে কথা ভাবিতে পরাণ শিহরে তাই ভাসে হিয়া কোণে,
 বালাই বালাই, ভালো হবে যাদু মনে মনে জাল বোনে ।
 ছেলে কয়, 'মাগো, পায়ে পড়ি বল ভালো যদি হই কাল,
 করিমের সাথে খেলিবারে গেলে দিবে নাত তুমি গাল ।
 আচ্ছা মা বলো, এমন হয় না রহিম চাচার ঝাড়া,
 এখনি আমারে এত রোগ হতে করিতে পারেত খাড়া?'
 মা কেবল বসি রুগ্ণ ছেলের মুখ পানে আঁখি মেলে,
 ভাসা ভাসা তার যত কথা যেন সারা প্রাণ দিয়ে গেলে ।
 'শোন মা, আমার লাটাই কিন্তু রাখিও যতন করে,
 রাখিও ট্যাপের মোয়া বেঁধে তুমি সাতনরি সিকা ভরে ।
 খেজুরে গুড়ের নয়া পাটালিতে হুড়ুমের কোলা ভরে ।
 ফুলঝুরি সিকা সাজাইয়া রেখো আমার সমুখ পরে ।'
 ছেলে চুপ করে, মাও ধীরে ধীরে মাথায় বুলায় হাত,
 বাহিরেতে নাচে জোনাকি আলোয় থম থম কাল রাত ।
 রুগ্ণ ছেলের শিয়রে বসিয়া কত কথা পড়ে মনে,
 কোন দিন সে যে মায়েরে না বলে গিয়াছিল দূর বনে ।
 সাঁঝ হয়ে গেল তবু আসে নাকো, আই টাই মার প্রাণ,
 হঠাৎ শুনিল আসিতেছে ছেলে হর্ষে করিয়া গান ।
 এক কোঁচ ভরা বেথুল তাহার ঝামুর ঝামুর বাজে,
 ওরে মুখপোড়া কোথা গিয়াছিলি এমনি এ কালি সাঁঝে ।

কত কথা আজ মনে পড়ে তার, গরীবের ঘর তার,
ছোটখাট কত বায়না ছেলের পারে নাই মিটাবার ।
আড়ঙের দিনে পুতুল কিনিতে পয়সা জোটেনি তাই,
বলেছে আমরা, মুসলমানের আড়ং দেখিতে নাই ।
করিম সে গেল? আজিজ চলিল? এমনি প্রশ্ন মালা,
উত্তর দিতে দুখিনী মায়ের দ্বিগুণ বাড়িত জ্বালা ।

আজও রোগে তার পথ্য জোটে নি, ওষুধ হয়নি আনা,
ঝড়ে কাঁপে যেন নীড়ের পাখিটি জড়িয়ে মায়ের ডানা ।
ঘরের চালেতে হুতুম ডাকিছে, অকল্যাণ এ সুর,
মরণের দূত এলো বুঝি হয়, হাঁকে মায়, দূর-দূর ।
পচা ডোবা হতে বিরহিনী ডাক ডাকিতেছে ঝুরি' ঝুরি',
কৃষাণ ছেলেরা কালকে তাহার বাচ্চা করেছে চুরি ।
ফেরে ভন্ ভন্ মশা দলে দলে, বুড়ো পাতা ঝরে বনে,
ফোঁটায় ফোঁটায় পাতা-চোঁয়া জল ঝরিছে তাহার সনে ।
রুগুণ ছেলের শিয়রে বসিয়া একেলা জাগিছে মাতা,
সম্মুখে তার ঘোর কুজ্জটি মহাকাল রাত পাতা ।
পার্শ্বে জ্বলিয়া মাটির প্রদীপ বাতাসে জমায় খেল;
আঁধারের সাথে যুঝিয়া তাহার ফুরায়ে এসেছে তেল ।

শব্দার্থ ও টীকা : *পচান* – পচে গেছে এমন । *নামাজের ঘরে মোমবাতি মানে* – নামাজের ঘর হলো মসজিদ, মোমবাতি মানে অর্থ হলো মোমবাতি দেওয়ার মানত করা । কোনো অসুখ-বিসুখ বা বিপদ-আপদ হলে এ দেশের মানুষ তা থেকে উদ্ধার পাওয়ার অভিপ্রায়ে এক ধরনের মানত করে । 'নামাজের ঘরে মোমবাতি মানে' অর্থ হলো মসজিদে মোমবাতি দেওয়ার প্রতিজ্ঞা বা মানত করা । *নয়ন নীর* – নয়ন হলো চোখ, নীর হলো পানি, নয়নের নীর হলো চোখের পানি । *রহিম চাচার ঝাড়া* – আমাদের দেশে রোগ-বলাই থেকে মুক্তি লাভের জন্য পানি পড়া, ঝাড়-ফুঁকের প্রচলন আছে । নানা ধরনের অসুখে অনেকে পানি পড়ে তা রুগীকে খেতে দেয়, রোগ থেকে মুক্তি লাভের উদ্দেশ্যে । 'রহিম চাচার ঝাড়া' মানে হলো রহিম চাচার সেই রকম একটি চিকিৎসা পদ্ধতি, যাতে 'রহিম চাচা' রুগী ছেলেটিকে ফুঁ দিয়ে সুস্থ করে তুলবে । *আড়ঙের দিনে* – আড়ং হলো হাট বা বাজার বা মেলা । আড়ঙের দিনে মানে হলো মেলার দিনে বা হাটের দিনে বা বাজারের দিনে ।

পাঠ-পরিচিতি : 'পল্লিজননী' কবিতাটি কবি জসীমউদ্দীনের *রাখালী* কাব্য থেকে সংকলন করা হয়েছে । মায়ের মতো মমতাময়ী আর কেউ নেই । রুগুণ পুত্রের শিয়রে বসে রাত জাগা এক মায়ের মনঃকষ্ট, পুত্রের চঞ্চলতা স্মরণ আর দারিদ্র্যের কারণে তাকে প্রয়োজনীয় খাদ্য ও আনন্দ-আয়োজন করতে না পারার ব্যর্থতা এ কবিতায় উল্লেখ করা হয়েছে । পুত্রের শিয়রে

নিবুনিবু প্রদীপ, চারিদিকে মশার অত্যাচার, বেড়ার ফাঁক গলে আসে রাতের শীত। রুগ্ণ পুত্রের ঘুম স্বাভাবিকভাবেই আসে না। মা পুত্রকে আদর করে, তার রোগ ভালো করে দেবার জন্য দরগায় মানত করে। দুরন্ত ছেলে ভালো হয়েই খেলতে যাবে এবং তখন মা তাকে কিছু বলতে পারবে না, এমন অঙ্গীকার সে মায়ের কাছ থেকে আদায় করে নেয়। আবদারমুখো পুত্রের দিকে চেয়ে গ্রামীণ মায়ের মনে অনেক কথা জাগে। তার সামর্থ্য নেই বলে রোগীর ঔষধ, পথ্য কিছুই জোটাতে পারেনি। রুগ্ণ পরিবেশে রোগী সামনে নিয়ে এক পল্লিমায়ের মনে পুত্র হারানোর শঙ্কা জেগে ওঠে। অপত্যস্নেহের অনিবার্য আকর্ষণই এ কবিতার মূলকথা।

অনুশীলনী

কর্ম-অনুশীলন

- ১। ‘সন্তানের প্রতি মায়ের ভালোবাসা অকৃত্রিম’- আলোচনা কর।
- ২। তোমার পড়াশোনায় মায়ের ভূমিকা বা প্রেরণার পরিচয় দাও।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

- ১। বাঁশ বনে বসে কোন পাখি ডাকে?

ক. কোকিল	খ. কানাকুয়ো
গ. হুতুম	ঘ. দোয়েল

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ২ ও ৩-সংখ্যক প্রশ্নের উত্তর দাও :

যতদিন যায়, দুর্ভোগ তার ততই বাড়িয়া যায়
জীবন-প্রদীপ নিভিয়া আসিছে অস্ত রবির প্রায়।

- ২। উদ্দীপকে প্রকাশ পেয়েছে ‘পল্লিজননী’ কবিতার-

ক. সন্তানের মুমূর্ষু অবস্থা	খ. অকৃত্রিম মাতৃস্নেহ
গ. আরোগ্য লাভের আকুতি	ঘ. রোগমুক্তির লক্ষণ

- ৩। উদ্দীপকে ফুটে ওঠা ভাবটি ‘পল্লিজননী’ কবিতার যে চরণে বিদ্যমান তা হলো -

ক. ঘরের চালেতে হুতুম ডাকিছে অকল্যাণ এ সুর মরণের দূত এলো বুঝি হায়, হাঁকে মায়, দূর-দূর।
--

- খ. নামাজের ঘরে মোমবাতি মানে, দরগায় মানে দান,
ছেলেবেলা তাহার ভালো করে দাও কাঁদে জননীর প্রাণ ।
- গ. পার্শ্বে জ্বলিয়া মাটির প্রদীপ বাতাসে জমায় খেল;
আঁধারের সাথে যুঝিয়া তাহার ফুরায়ে এসেছে তেল ।
- ঘ. মা কেবল বসি রুগ্ণ ছেলের মুখ পানে আঁখি মেলে
ভাষা ভাষা তার যত কথা যেন সারা প্রাণ দিয়ে গেলে ।

সৃজনশীল প্রশ্ন

বাদশা বাবর কাঁদিয়া ফিরিছে, নিদ নাহি চোখে তাঁর
পুত্র তাঁহার হুমায়ুন বুঝি বাঁচে না এবার আর ।
চারিধারে তাঁর ঘনায়ে আসিছে মরণ অন্ধকার ।

- ক. ‘পল্লিজননী’ কবিতায় ছেলে মাকে কী যত্ন করে রাখার কথা বলেছে?
- খ. ‘আজও রোগে তার পথ্য জোটে নি’ – পথ্য না জোটায় কারণ কী?
- গ. উদ্দীপকে ‘পল্লিজননী’ কবিতার যে দিকটি প্রতিফলিত হয়েছে তা ব্যাখ্যা কর ।
- ঘ. প্রতিফলিত দিকটিই ‘পল্লিজননী’ কবিতার সামগ্রিক ভাবকে ধারণ করে কি?
যুক্তিসহ প্রমাণ কর ।